গঙ্গা খোঁজে ভগীরথ

মহীতোষ বিশ্বাস

গ্রন্থতীর্থ
GRANTHA TIRTHA CALCUTTA
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

।। ১ ।।
ভগীরথের জন্ম-বৃত্তান্ত

বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। অবিরাম ধারায়। এবং এমত ধারা- পতন, মানুষের মনে নানা প্রশ্ন জাগায়। এর আগে এমন ধারা-পতন কবে দেখেছে - ইত্যাদি। প্রথম রাত গড়িয়ে শেষ রাত এল। কখনো বা একটু ধরেছে। পরক্ষণে এসেছে ঝাঁপিয়ে। শান্তরাম বারান্দার এক কোণে ব'সে ঝিমোয়, কিন্তু ঘুম আসে না। খড়ের চাল দিয়ে অবিরাম জল গড়াচ্ছে নিচে, মাঝে মাঝে ঝাপটা আসে। গায়ের কাপড়টা টেনে-টুনে আরো গায়ের সঙ্গে সাপ্‌টাতে চায়। ঘরের ভিতরে বাঁশের বেড়া থেকে একতারাটি নামিয়ে এনেছিল। দু'একবার টুংটাং ক'রে রেখে দিয়েছে। মন বসেনি। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দের মধ্যেও ওর শ্রবণেন্দ্রিয়টা নিবদ্ধ ছিল রান্নাঘরের পাশের ছোট চালাঘরটার দিকে। ওটা আঁতুড়ঘর। অন্নমতি বিকেল থেকে ওখানে শুয়ে। প্রসব বেদনায় লাট খাচ্ছে। একবার একটু ঝিম আসে শান্তরামের। কিন্তু চমকে উঠল পরক্ষণেই। চালাঘরটা থেকে কি একটা শিশুর কান্না ককিয়ে উঠল ? নাঃ - কিছু না। বৃষ্টির মধ্যে বাতাস শিস্ দিচ্ছে।

সন্ধে থেকে অলঙ্গ নানারকম প্রক্রিয়া চালাচ্ছে প্রসবটা ত্বরান্বিত করতে। কিন্তু ওর যাবতীয় প্রক্রিয়া ব্যর্থ হচ্ছে। এসব ব্যাপারে ওর হাতযশ সুবিদিত। গোটা অঞ্চলে দাই বলতে লোকে একবাক্যে চেনে অলঙ্গকে। সে সকলের দাই পিসি। কিন্তু সেই অলঙ্গরও হাতযশ সারা রাত ধরে হার মেনে চলে। থেকে থেকে অন্নমতির কাতর আর্তনাদ বড় উতল ছড়ায়। বৃষ্টির ধারাপতনের শব্দও হার মানে তাতে। অন্নমতির মরণাপন্ন আর্তনাদ ব্যাকুল করে অলঙ্গকে। চালাঘরের স্বল্প পরিসরে আরো কটি বয়স্ক নারীমুখ। এসব কাজে কমবেশি অভিজ্ঞতা আছে তাদেরও। কিন্তু অলঙ্গ এবং এদের সমবেত অভিজ্ঞতা অন্নমতির ক্ষেত্রে কোনো সুফল দেয়না।

অবশেষে ভোর রাতের দিকে প্রসব হয় অন্নমতির। প্রসব হতেই জ্ঞান হারায় অন্নমতি। এতক্ষণ অন্নমতি ছটফট করছিল কাটা পাঁঠার মতো। এখন জ্ঞান হারিয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে। অলঙ্গ অত্যন্ত মনোযোগে এ-সময় তার জানা ধাত্রীবিদ্যার কাজগুলো সারছিল। মাতৃঅঙ্গ থেকে শিশুর মাথা বের হবামাত্র শিশুটির মুখমন্ডলের লালা শ্লেষ্মাদি পরিষ্কার করে দিল। শিশুর নাভি-নাড়ী হাতের মতো জড়িয়ে ছিল তার গলায়। নাড়ীর মধ্যে আঙুল দিয়ে অলঙ্গ ঢিলা করে দিল নাড়ীটাকে। তার মধ্য দিয়ে শিশুর কাঁধটা বেরিয়ে এল সহজেই। এবার অলঙ্গ শিশুর নাভির উপর তিন আঙুল প্রমাণ নাড়ী রেখে নরম রেশম দিয়ে দুটি শক্ত বাঁধন দিল। তার উপর আর এক আঙুল প্রমাণ নাড়ী রেখে ঐ রকম আরো দুটি বাঁধন দিল। শিশু আর প্রসূতির দিকে নাড়ী বেঁধে দুটি বাঁধনের মাঝামাঝি নাড়ীটি কেটে দিল ধারালো বাঁশের চোঁচ দিয়ে।

ভূমিষ্ঠ হবার পরই কেঁদে ওঠে শিশুটি। বোঝা যায়, তার স্বাভাবিক শ্বাস-ক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্বাভাবিক প্রসবে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। এই কান্না সুলক্ষণ। শিশুটি কেঁদে উঠতেই চালাঘরের সকলের মুখ হাসিতে আটখানা। জন্মের সময় শিশু কাঁদে, আর সবাই হাসে।

মৃত্যুর সময় সবাইকে কাঁদিয়ে যদি নিজে হাসতে হাসতে চলে যাওয়া যায়, তাহলে সেই যাওয়াটাই সেরা যাওয়া।

এসব কাজের মধ্যেও অলঙ্গ নির্দেশ দিল ----'ওরে ব্যাটা-ছেলে নেমেছে। শাঁখ বাজা। উলু দে।'

শাঁখ এবং উলুর শব্দে কেঁপে উঠল শান্তরাম। এ শব্দ সুলক্ষণের --- এটা অজানা নয় শান্তরামের। তার মন থেকে নেমে যায় এতক্ষণের ভারটা। কিন্তু সে জায়গা থেকে নড়েনা। ভারমুক্ত একটা প্রশান্তি নিয়ে বসে থাকে চুপচাপ।

সব কাজ সেরে, চালাঘরের বাইরে আসে অলঙ্গ। পুব আকাশে সূর্য ঢলানি দিয়েছে। আবছা আলোর উদয়রাগ চারদিকে। বৃষ্টিটাও ধরেছে এতক্ষণে। আঁতুড়-ঘরের একটি বউ তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে এসে পাটকাঠি গুঁজে দেয় উনুনে। হাঁড়িতে জল গরম করে এনে রাখে অলঙ্গর সামনে। খানিকটে কাপড়-কাচা ক্ষার দিয়ে অলঙ্গ হাত ধোয় কচ্‌লে কচ্‌লে। পয়-পরিষ্কার হয়ে আসে এঘরে। অলঙ্গকে আসতেদেখে উঠে দাঁড়ায় শান্তরাম। কোনো দুঃসংবাদ যে নেই, এটা জানে শান্তরাম। তবু কাঁচুমাচু বিনীত ভঙ্গিতে বলে - 'খবর কি পিসি?'

অলঙ্গর মুখে সফলতার হাসি --- 'ব্যাটা-পুত্তুর জন্মেছে রে বাবা তোর। একেবারে রাজপুত্তুরের মতন চেহারা। দাইপিসিকে কিন্তু জোড়া-বস্তর বকশিশ দিতি হবে বাপ।'

বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে শান্তরাম। তবে এ কথা আলাদা ক'রে মনে করিয়ে দেবার দরকার করেনা দাইপিসির। এটা তো দাইয়ের বাঁধা পাওনা। কন্যা সন্তানে এক বস্ত্র। পুত্র সন্তানে জোড়া বস্ত্র। আর নগদ কিছু বখ্‌শিশ সঙ্গতি অনুযায়ী। গোটা তল্লাট জুড়েই এই নিয়ম। এ দানে কারও মুখ ভার হয়না। এ বড়ো আনন্দের দান।

অলঙ্গ বলে - ' তবে, পুত্তুরটা তোর বড়ো বাদুলে। বিষ্টির রকমটা দ্যাখ্ দেখি কাল থেকে। একেবারে আকাশ থেকে গঙ্গা নামিয়ে তবে আস্‌লো পিরথিবিতে। ভগীরথের মতো গঙ্গা নামানো ছেলে তোর। তোর ছেলেরও আমি নাম দিয়ে গেলাম ভগীরথ। তবে বাদুলে ছেলে তো ! সারাজীবন ঝরায় খরায় মানুষ হবে।'

দাই পিসির কথায় হাসা ছাড়া শান্তরামের আর কী করার আছে ! অলঙ্গ আবার আঁতুড় ঘরটায় ঢুকল। জ্ঞান ফিরে এসেছে অন্নমতির। ছেলেকে কোলের কাছে নিয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে অন্নমতি। তবে ওর ক্লান্ত ধ্বস্ত চেহারাতেও সর্বাঙ্গে এক মাতৃত্বের আভা।

সূর্য উঠতে এখনো দেরি আছে। কিন্তু ক্রমশ আলো ছড়াচ্ছে প্রভাতি আকাশ। চরাচরে জেগে উঠেছে জীবকূল। বারান্দার খুঁটিটায় হেলান দিয়ে বসে থাকে শান্তরাম। একতারাটা তুলে নেয় হাতে। টুং টুং করে বাজায় কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে, গুন্‌গুন্ ক'রে, যেন শুধু নিজেকে শোনাতে, গেয়ে চলে একটা গানের কলি - 'গুরু, ও গুরু আমারে, এ কী লীলা দেখালে সংসারে।'

সত্যিই, এ বড়ো এক বিচিত্র লীলা শান্তরামের জীবনে। শান্তরাম যে কখনও সংসারী হবে, বিয়ে-থা করবে, ছেলের বাপ হবে, --- এসব শান্তরামই কী ভেবেছিল কখনও। অথচ এ সবই তো ঘটে গেল তার জীবনে। এটা গুরুর লীলা ছাড়া আর কী ! অর্থাৎ, এরকমভাবেই সমস্ত ব্যাপারটাকে দেখে শান্তরাম। নিজের মা-বাবাকে কখনও দেখেনি সে। ওকে পৃথিবীতে এনেই, বলা যায় আনতে গিয়ে, ওর মাকে পৃথিবী ছাড়তে হয়। কিছুদিন বাদে ওর বাবাও ফক্কা। এবং এ সবকথাই ওর শোনা কথা। বয়স্ক পাড়াপ্রতিবেশী, অন্তরঙ্গদের কাছ থেকে এ সব তথ্য তার সংগ্রহে এসেছে। জ্ঞানত ওর মনে মা-বাবার কোনো স্মৃতি নেই। শুধু মা বাবা নামক দুটি কাল্পনিক প্রাণীর আবছা প্রতিভাস দোল খায় তার

মনে। এক খোঁড়া কাকার কথা শুধু মনে আছে। দূর সম্পর্কের পাড়াতুতো কাকা। কিন্তু সম্পর্ক যতই দূরের হোক, এই প্রতিবন্ধী মানুষটি মা-বাপ মরা শান্তরামকে বড়ো যত্ন এবং মমতায় বুকে টেনে নিয়েছিল। সেই শৈশবে জল এবং অন্ন দিয়ে এই খোঁড়া কাকাই একটু একটু ক'রে বড় করে তুলেছিল তাকে। সেই সঙ্গে কাকা তাকে শরিক করে তুলেছিল জীবনের নানা অভিজ্ঞতারও। সংসারের নানা কাজকর্ম, চাষ- আবাদের নানা করণ-কৌশল -- এসবেরও শিক্ষালাভ ঘটেছিল কাকার সুবাদেই।

খোঁড়া এই কাকাটি সংসারী হয়নি। কিন্তু ভাইপোটি সা-জোয়ান হতেই তার বিয়ের ব্যাপারে উঠে-পড়ে লেগেছিল। মেয়ে এনেছিল মল্লিকাঠির রায় বাড়ী থেকে। রায়কর্তার মেয়ে। দাপুটে লোক ছিল বলে লোকে তার নাম দিয়েছিল রায়কর্তা। আটবন্দের তিনখানা টিনের ঘর, জমিজায়গা, চাষবাস, গোয়াল ভর্তি গোরু আরভেড়ার পাল --- সব মিলিয়ে রমরম অবস্থা। আটটি ছেলেমেয়ে রায়কর্তার। তিনটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে। সন্তানদের ধারাবাহিকতায় অন্নমতির স্থান ছিল সপ্তম। মা - বাপ নেই, চালচুলোহীন, এরকম একটি ছেলের হাতে অন্নমতিকে তুলে দিতে কিছুটা দ্বিধায় যে পড়েনি রায়কর্তা, তা নয়। কিন্তু পরপর তিনটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে রায়কর্তা তখন ক্লান্ত। অন্নমতির পরেও বাকি রয়েছে আরো একটা মেয়ে। সুতরাং অন্নমতির জন্য শান্তরামকে জামাই বাছতে তার বেশি ভাবনার অবকাশ রইল না। নেই নেই করেও যা হোক মাথার পরে একজন কাকা আছে শান্তরামের। হোক পাতানো, তবু অভিভাবক তো বটে ! আর মানুষের সম্পর্ক তো শুধু রক্ত দিয়ে হয়না। মনের টান দিয়েও হয়। বিচক্ষণ রায় কর্তার হিসেবী বিবেচনায় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রাহ্য হ'ল এসব কথাও। তাছাড়া, চেহারা স্বভাবে শান্তরাম কোনোদিকেই ফেলনা নয় পাত্র হিসেবে। অতএব শুভলগ্নে শান্তরাম আর অন্নমতির দু'হাত এক করে দিয়েছিল রায়কর্তা। তবে মেয়ের যাতে অন্নবস্ত্রের অভাব না হয়, সেজন্য রায়কর্তা তিন বিঘে বিলেন জমির বন্দোবস্ত দিয়েছিল অন্নমতির নামে। ভালো ফসল হত জমিটায়।

সুতরাং সব মিলিয়ে সুখের অভাব ছিল না। কিন্তু মানুষের সুখের বিধান এবং ঈশ্বরের সুখের বিধান বোধহয় একরকম নয়। বিয়ের মাস ছয়েকের মধ্যেই হঠাৎ এল বিপর্যয়। সামান্য কয়েকদিনের জ্বরে হঠাৎই মারা গেল শান্তরামের কাকা। এবং, বলাবাহুল্য, ছোটবেলায় মা-বাপ মরা শান্তরাম দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হল। এবং প্রকৃত অর্থে, সে যথার্থ পিতৃহীন হল এবারই।

শোকটা সামলাতে পারেনি শান্তরাম। সীমাহীন নির্বেদ তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। বৈশাখের খর - রৌদ্রে ফট ক'রে ফেটে যাওয়া শুকনো শিমূল ফলের সূক্ষ্ম তুলাতন্তুর মতো তার মনটা শূন্য থেকে মহাশূন্যে হয়ে উঠেছিল নির্ভার, ভাসমান। ছ-মাসের বিয়ে করা নতুন বউ, শ্বশুরের দেওয়া জমি, কাকার স্মৃতি এবং সামান্য জমি-জিরেত --- কোনো কিছুই গুরুত্ব পেলনা তার কাছে। একদিন একবস্ত্রে ঘর ছাড়ল শান্তরাম।

তারপর পাকা আটটি বছর সে নিরুদ্দেশ। বেমালুম হাওয়া। রায়কর্তা পাগলের মতো খোঁজাখুঁজি করেছিল চারিদিকে। রায়কর্তার ছেলেরাও সব ভারবুদ্ধির মানুষ। তারাও উঠে পড়ে লেগেছিল শান্তরামকে খুঁজে বের করতে। বিল-বাওড় আর চাষাবাদের ক্ষেত-জমিতে ঘেরা তল্লাট। এসবের মধ্যে কোথায় যেতে পারে ছেলেটা! দূর দেশে শান্তরামের কোনো স্বজন বান্ধবদের কথাও তো জানা নেই কারো। কিন্তু জলজ্যান্ত একটা মানুষ কী করে এমন হাওয়া হয়ে যেতে পারে, এটা কারো বুদ্ধিতে কুলোলো না। অসহায় অন্নমতি কোথায় আর যাবে ! শ্বশুরকূলে আশ্রয় দেবার মতো তো কেউ নেই। বিয়ের ছমাসের মধ্যেই তাকে আবার ফিরে যেতে হল বাপের বাড়িতে। অযত্ন হলনা। কিন্তু সবাই যেন একটু করুণার চোখে দেখে অন্নমতিকে।

অবশেষে পাক্কা আটটি বছর বাদে খোঁজ পাওয়া গেল শান্তরামের। এ তল্লাট থেকে পশ্চিমদিকে হাঁটাপথে একদিনের রাস্তা পার হয়ে বুধোপুরের শ্মশান। দিনে আট-দশটা শব দাহ তো সেখানে সামান্য ঘটনা। ওখানেই গিয়ে জুটেছিল। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবক তখন সে। কিন্তু দীর্ঘ চুলদাড়ি, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, লাল কাপড় — সব মিলিয়ে শান্তরাম তখন ঘোরতর সন্ন্যাসী। ঐ শ্মশানের এক কাপালিকের কাছে তন্ত্রশাস্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে । শবসাধনা ইত্যাদি আরো কী সব তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ হয়ে সে তখন এক ছাপ্পামারা কাপালিক। রায়কর্তার এক কুটুমের কুটুম ছিল ঐ অঞ্চলের মানুষ। সেই প্রথমে চিনতে পারে শান্তরামকে এবং খবরটা পাঠায় রায়কর্তাকে।

তবে শান্তরামকে সরিয়ে আনতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। বড় দুই ছেলে এবং গাঁয়ের আরো কয়েকজন ষন্ডামার্কা লোক নিয়ে রায়কর্তা নিজে গিয়েছিল বুধোপুরের শ্মশানে। গুরু কাপালিক এবং শিষ্য শান্তরাম, দুজনেই বাধা দিয়েছিল। কিন্তু রায়কর্তাদের বাহুবলের সঙ্গে ওরা পেরে ওঠেনি। এবং প্রায় বেঁধেই ধরে আনা হয়েছিল শান্তরামকে।

কিছুদিন একটু বেগড়বাই করেছিল শান্তরাম। কিন্তু ওকে তক্কে-তক্কে রেখেছিল রায় কর্তা। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হয়েছিল এবং পোষ মেনেছিল শান্তরাম। এখন কাপালিক-জীবনের সেই উচ্চন্ডতা কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবে সংসারী হলেও একটা উদাসীনতার বলয় যেন তাকে ঘিরে রাখে সব সময়। এবং সব মিলিয়ে সে এখন এক গৃহী সন্ন্যাসী। ধীরে ধীরে সংসারে জড়িয়ে পড়া, যৌবনবতী অন্নমতির প্রেমের স্পর্শ এবং পরিণতিতে এই পুত্রলাভ শান্তরামকে ভিন্নতর এক অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির শরিক করে।

আঁতুড় ঘরের মহিলারা যে যার সম্পর্ক অনুযায়ী শান্তরামকে ডাকতে থাকে আঁতুড়ঘরে। বাপ এবার তার ছেলের মুখ দেখবে। ধীর পায়ে আঁতুড় ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় শান্তরাম। পাটকাঠির বেড়াটা একটু ঠেলে দিতেই সকালের নতুন আলোয় ভরে যায় ঘরটা। সেই আলো ছড়িয়ে পড়ে শিশুটিরও সর্বাঙ্গে। নতুন জগতের আলো এখনও তার চোখ-সহা হয়নি। চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে।

শান্তরামের মনে পড়ে, দাই পিসি ওর নামকরণ করে গেছে ভগীরথ। ভগীরথের ইতিবৃত্ত কিছু কিছু জানে শান্তরাম অর্থাৎ প্রবীণদের মুখে শুনেছে। রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ তিনি। কপিল মুনির অভিশাপে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। তাদের মুক্তির জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন উত্তর-পুরুষ ভগীরথ। আর সেই তপস্যার বলে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন মুক্তি - দায়িনী পতিতপাবনী গঙ্গাকে। শাপমুক্ত করেছিলেন ভগীরথ তার ষাট হাজার পূর্বপুরুষকে। দাইপিসি সেই মহাপুরুষের নামে নাম রেখে গেল তার ছেলের। বাদুলে ছেলে। গঙ্গা ধারার মতো বৃষ্টিধারা মাথায় করে এনেছে। অমনি পিসি তার নাম দিয়ে গেল ভগীরথ। ভগীরথ হওয়া কী অত সহজ !

তবু এসব কথা ভাবে শান্তরাম, আর একটা প্রশান্তি অনুভব করে ভিতরে ভিতরে। সেই আত্মগত সমাহিত অবস্থার মধ্যে, হঠাৎ যেন তার নাভিকুন্ড থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সে দুইহাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে , আত্মলীন উচ্চারণে বলে - 'গুরু, সবই তোমার ইচ্ছে !'

আঁতুড় ঘরের বয়স্কা মহিলাদের মধ্যে একজন ছিল কিছু চটুল প্রকৃতির। শান্তরামকে উদ্দেশ করে সে বলে - 'কি গো বাছা, নতুন বাবা হয়ে, ছেলের মুখ দেখে যে একেবারে বোম্ ভোলা হয়ে গেলে ? এগোয়ে এসে ছেলেরে কোলে নাও।'

লজ্জা পায় শান্তরাম। একটু হেসে পালিয়ে আসে আঁতুড় ঘর থেকে।

।। ২ ।।

ভগীরথের শৈশব

বিশাল দুটো জালায় খেজুর রস জ্বাল দিচ্ছে অন্নমতি। 'জালা' কথাটি স্থানীয় অপভ্রষ্টতায় পরিণত হয়েছে 'জালই'তে। দুমুখো উনুন। দুটোতেই দুটো জালই পাতা। তাত-রসটা শুকিয়ে গুড়ে পরিণত হবার মুখে। টগবগ করে ফুটছে। দুমুখো উনুনটায় জ্বালানী জোগানের মুখ একটাই। সে মুখে মাঝে মাঝেই নাড়া গুঁজে দিচ্ছে অন্নমতি। শুকনো হালকা নাড়ার খড়ে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে। উনুনের ওপাশে টলমল করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বছর চারেকের নাদুস্ নুদুস্ ভগীরথ। হঠাৎ সে একটা বাটি হাতে ছুটে আসে এক্কেবারে উনুনের কাছে। বাটিটা উঁচু করে ধরে আধো আধো গলায় চীৎকার করে বলে - 'ওমা গুর খাবো - ওমা গুর খাবো।'

গরম জালার একেবারে বিপজ্জনক কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে ভগীরথ। অন্নমতি তাড়াতাড়ি ওপাশটায় গিয়ে ভগীরথকে সরিয়ে দেয় কিছুটা। ভগীরথ কিন্তু সমানে বলে চলেছে - 'ওমা গুর খাবো।'

অন্নমতি বলে - 'এট্টু দাঁড়া বাবা। আর এট্টু জ্বাল দিয়ে পাটালি বানাবো। পাটালি খাস্।'

ভগীরথ নাছোড়বান্দা - 'না মা, গুর খাবো।'

অন্নমতি হার মানে ছেলের কাছে। 'ওড়োং' ডুবিয়ে দেয় একটা গরম জালার মধ্যে। একটা লম্বা বাঁশের কাঠির মাথায় একটা নারিকেলের পরিষ্কার মালা লাগানো। হাতার প্রতিরূপ। স্থানীয় নাম 'ওড়োং'। ওড়োংয়ের মধ্যে খানিকটা পাতলা গুড় তুলে আনে অন্নমতি। গুড়টা একটু ঠান্ডা করে ঢেলে দেয় ভগীরথের বাটিতে। ভগীরথ বাটিটা নিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে চলে যায়। এই বয়সেই বেশ ভোজনপটু হয়েছে ভগীরথ। ভগীরথের টলমল গতিটার দিকে তাকিয়ে থাকে অন্নমতি। স্নিগ্ধ একটা প্রশান্তি আচ্ছন্ন করে অন্নমতির মনটাকে। স্বামী পুত্রকে নিয়ে এই ভরভরান্তি সংসার যে কোনোদিন আসবে তার জীবনে, এটা একসময়ে একেবারেই দুস্তর চিন্তা ছিল তার জীবনে।

শীতের ঘর-গেরস্তালি আর রান্নাবান্নার কাজের সঙ্গে এই রসজ্বালানোও একটা বাড়তি কাজ। ওদের ভিটে বাড়িটার চারপাশ ঘিরে অনেকগুলো খেজুর গাছ। খেজুর গাছগুলোর বাগলো পাতা ঝুড়ে নল, হাঁড়ি বসিয়ে রস বের করার কাজটা করে পাড়ার গৌর গাছি । গাছ কাটে বলে গাছি। সপ্তাহে দুদিন অন্তর রসস্থান চেঁছে নলে হাঁড়ি বসানো হয়। একদিনেরটা এরা পায়। অন্যদিনের রস নেয় গাছি। প্রত্যেকটা গাছই ভালো রস দেয়। রস জ্বাল দিয়ে পাটালি বানায় অন্নমতি। সপ্তাহে দুদিন হাট বসে চামুরালি। শান্তরাম পাটালিগুলো নিয়ে চামুরালির হাটে বিক্রি করে আসে। কিছু সাশ্রয় হয় সংসারের।

ভিটেটার শেষ প্রান্তে একটা লম্বা খেজুর গাছের মাথায় হাঁড়ি বসাচ্ছিল গৌরগাছি। হেঁসো দিয়ে রসের জায়গাটা মসৃণ করে চেঁছে পরিষ্কার করে নিচ্ছিল। খেজুরগাছের নিচে কিচির মিচির করছিল একদল কচিকাঁচা। রস খাবার লোভ তো থাকেই। আরো একটা সুখাদ্য পাওয়া যায়। লম্বা বাগলোগুলোর নিচে সংলগ্ন থাকে খেজুরের মোচা বা থোড়। খুবই সুস্বাদু। গাছির হেঁসোর কোপে ওগুলো নিচে পড়তেই মহোল্লাসে সেগুলো কাড়াকাড়ি করে খায় বাচ্চাগুলো। গৌরগাছি গাছ কাটছে। কিন্তু ওর কাছ থেকে খেজুরের মোচার কোন আশা আজ আর নেই। বাচ্চাগুলো হতাশ হয়ে গৌরগাছিকে শুনিয়ে শুনিয়ে ছড়া কাটে, হাততালি দেয় - 'গাছি গাছ কাটে, গাছির বউ ছোগ্‌লা চাটে।'